



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 159 - 167

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা ও দলিত আত্মপরিচয়ের নির্মাণ

ড. তন্ময় সরকার

Email ID: tanmay14.net@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Proletariat,
Subaltern,
Narrative of
resistance,
Self hood,
Marginality.

Abstract

In Contemporary Bengali writings, Dalit literature is an important cultural and political phenomena. For a long time, while the mainstream literature rejects the life-world of the marginal people, Dalit literature has given a voice and vision to them. Manoranjan Byapari is an important writer in this line. In his short stories, we get Dalit lives under the precipice of everyday prattle. His writings reflect Dalit consciousness not just as a political resistance, rather the complex underplay towards the making of Self hood. Therefore, this paper presents the identity and Self hood of Dalit lives in the short stories of Manoranjan Byapari.

Discussion

বাংলা তথা ভারতীয় দলিত সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক মানুষের জীবনচিত্র উপস্থিত থাকলেও দলিত সমাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, আত্মকথন ও প্রতিবাদী চেতনা দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থেকেছে। নিম্নবর্গীয় মানুষের যন্ত্রণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহানুভূতির ভাষায় উপস্থাপিত হলেও জাতিভিত্তিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ এবং আত্মপরিচয়ের নির্মাণ সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই শূন্যস্থান পূরণে বাংলা দলিত সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দলিত সাহিত্য কেবল দুঃখ ও বঞ্চনার বিবরণ নয়; এটি সামাজিক বৈষম্য, জাতিগত অপমান ও প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চা। এই সাহিত্যে প্রতিবাদ ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশমাত্র নয়, বরং তা দলিত মানুষের আত্মমর্যাদা ও সামষ্টিক আত্মপরিচয় নির্মাণের একটি মৌলিক উপাদান। আত্মজীবনীমূলক অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলিত লেখকেরা নিজেদের অস্তিত্বকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেন।

মনোরঞ্জন ব্যাপারী বাংলা দলিত সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর ছোটগল্পে দলিত জীবনের সামাজিক অবমাননা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও দৈনন্দিন লাঞ্ছনার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠলেও সেখানে নিছক ভুক্তভোগীর ভাষা নয়, বরং প্রতিবাদী চেতনার স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পের চরিত্রেরা ক্ষমতামূলক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে এবং এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই তাদের দলিত আত্মপরিচয়ের নির্মাণ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এই প্রবন্ধে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনার রূপ ও দলিত আত্মপরিচয়ের নির্মাণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। আর এক

শিখণ্ডী' গল্পে শাসকদলের চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে নোনামাটি বস্তির মানুষেরা চরম বিপদে পড়ে। প্রশাসনের তরফে নোটিশ জারি করে উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে বস্তিবাসীদের সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়। কলকাতাকে আধুনিক শহর বানানোর জন্য নাকি এই উচ্ছেদ। দেশ বিদেশ থেকে যখন ভদ্র সুদর্শন মানুষজন ও পর্যটকরা আসে তখন এই বস্তি দেখে আঁতকে ওঠে। লেখকের ভাষ্যে উঠে আসে -

“কালো কালো ভূতসদৃশ কতকগুলো উদ্যম মানুষ, আদিম গুহাতুল্য কতকগুলো হোগলা দরমা পচা টিনের নুয়ে পড়া ঝুপড়ি, সার খাটা পায়খানা, ছাল-ওঠা সিবলিস আক্রান্ত কতকগুলো কুকুর, পা ছড়িয়ে বসে উকুন বাছা মেয়েমানুষ, কচুরিপানা বোঝাই পচা ডবা, উদ্যম উলঙ্গ ঝাঁক ঝাঁক বাচ্চা - সব মিলিয়ে পরিবেশটা বীভৎস, চোখের পক্ষে অসহ্য। বিশেষ করে সেই চোখ, যা দামি চশমার দিকে ঢাকা।”^১

সরকারের পক্ষ থেকে শুরু হয় তোড়জোড়। সরকারপক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি মৈনাক মুখার্জি বস্তিপাড়াতে উপস্থিত হয়। এতে বস্তিবাসীরা কোনোমতেই ভিটেমাটি ছাড়ার পক্ষপাত নয়। বস্তিবাসীদের নমনীয় করতে সরকারি পক্ষ থেকে বলপ্রয়োগ শুরু হয়। এই সময় বেশকিছু লোককে লাঠিপেটা করে জেলে পুরে দেয় প্রশাসন। শুরু হয় অশান্তি। তারা অস্তিত্বের সংকটে জীবন দেবে তবুও বস্তিকে উচ্ছেদ করতে দেবে না। বস্তিবাসীদের কাছের নেতা বিভু মণ্ডল এই সময়ে এসে উপস্থিত হয়। শুরু হয় আলোচনা। সরকারপক্ষের মৈনাক মুখার্জির কথা শ্রমজীবী বস্তিবাসীরা বুঝতে পারেনি। সেরকমই একটি -

“নোনামাটি থাকুক, আপনারাও থাকুন, তবে বস্তিটা থাকবে না। সুন্দর কলকাতার স্বার্থে এখানে বস্তি রাখা যাবে না।”^২

আলোচনা সাপেক্ষে মোটামুটি বস্তিবাসীরা এ প্রস্তাব মেনে নেয়। তারা নিজেরাও জানে এর পরিণতি কি আছে। বস্তিবাসীর নেতা বিভু মণ্ডল এরপর সরকারপক্ষের কথা শুনে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন। এদিকে বস্তিবাসীরা সুসংবাদের জন্য প্রহর গুনতে থাকে। সরকারি প্রতিনিধি মৈনাক মুখার্জি বিভু মণ্ডলকে কিছু প্রলোভন দেখিয়ে স্বার্থের জন্য বস্তিবাসী উচ্ছেদ করার পক্ষে রায় দেন। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর এই গল্পে অসহায় মানুষদের প্রতিফলন হয়, আজ সারা ভারতবর্ষজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সরকার অনেক সময় নিজ স্বার্থে বলপ্রয়োগ করার চেষ্টা করে। যদি তারা রাজি না হয় তখন সুকৌশলে নেতাদের কাজে লাগিয়ে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করার কাজকে সহজ করে নেয়। যেমন এই গল্পে নিজ স্বার্থের জন্য অসহায় মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বিভু মণ্ডল সরকারপক্ষের প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়। আর এই ঘটনায় চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়ে বস্তিবাসীরা।

‘খাঁচাভাঙ্গা বাধ’ গল্পে এক আদিবাসী বিধবার কন্যা সুন্দরীকে তার দূর সম্পর্কের মামা অভয় ভালো কাজের লোভ দেখিয়ে দিল্লির নিষিদ্ধপল্লীতে বিক্রি করে দেয়। সেখানি গিয়ে সুন্দরী দেখতে পায় তার মতো অনেক মেয়েও এই পথের পথিক। প্রহর গুনতে থাকে সুন্দরীরা। লেখক জানিয়েছেন -

“এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন, যেমন কাটে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দির। মুক্তির কোনো আশা নেই। তবে আর কেঁদে কেটে কী হবে। সয়ে যাও সব অপমান অত্যাচার নিজের ভাগ্য মনে করে।”^৩

তবে একদিন সুযোগ আসে। সুন্দরীসহ কয়েকজন মেয়ে পাহারাদারের অসতর্কতায় বাইরের মুক্ত জগতে পা রাখতে সমর্থ হয়। ঘটনাচক্রে বাড়ি ফেরার জন্য তারা একদিন এক ট্রাকে ওঠে। সেখানেও ট্রাক ড্রাইভারসহ অন্যান্যদের কাছে ধর্ষণের শিকার হতে হয়। এই অত্যাচারের পর ট্রাক ড্রাইভার তাদেরকে ছেড়ে দেয়। কোনোক্রমে সুন্দরী বাড়ি এসে সেই মলিন ঘরে প্রবেশ করে এবং জানতে পারে তার মামা নাকি তার মাকে সুন্দরীর কাছে পাঠায়। সুন্দরীর বুঝতে অসুবিধা হয় না তার এই ঘৃণ্য মামা তার মায়ের সঙ্গে কি করেছে। এই ক্ষোভ আর ক্রোধে সুন্দরী তার মামার বাড়িতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মামার উপর। তারপর ধারালো দাঁতের কামড় বসিয়ে গলার নলি চেপে ধরে খাঁচাভাঙ্গা বাধিনীর মতো। দলিত জীবনযন্ত্রণার একটি ছোটগল্প হল ‘ষড়যন্ত্র’। মহাভারতের জতুগৃহের ঘটনার প্রেক্ষাপটে লেখা ‘ষড়যন্ত্র’ গল্পটিতে লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মনুবাদী শাস্ত্র এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে দলিতকে দমনের জন্য। গল্পের মূল বিষয়বস্তু নিষাদ সম্প্রদায়ের অভুক্ত মা ও পাঁচ সন্তানকে খাবারের লোভ দেখিয়ে পঞ্চপাণ্ডব এবং কুন্তি শত্রুর চোখে নিজেদের

মৃত্যুর নিদর্শন হিসাবে ঐ ছয়জনকে অবচেতন করে আঙুনে পুড়িয়ে মারে। কুস্তি দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেয় -

“ওরা নিষাদ, অনার্য, ছোটোলোক ছোটোজাত। ওরা রোগে শোকে অনাহারে দৈবদুর্যোগে অনবরত মরতেই থাকে। খরা-বন্যা-মহামারিতে হাজারে হাজারে পোকামাকড়ের মতো মরে যায়।”^৪

আসলে লেখক এখানে বর্ণবাদ কতটা নির্মম ও ভয়াবহ হতে পারে তার নিদর্শন দিয়েছেন। ধর্ম, শাস্ত্র, নীতিকথা, স্বর্গ-নরক এবং ঈশ্বর সবকিছুকেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। দীর্ঘদিন সংস্কার ও শিকল পরিয়ে দলিতদের অন্ধবিশ্বাসে বন্দী করে রাখা হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি রাজনীতি ও অর্থনীতি সমস্তকিছুতেই উচ্চবর্ণ শীর্ষে আসীন। দলিতরা সর্বত্র নির্যাতনের স্বীকার। বেদের যুগ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন নেই। রাষ্ট্রশক্তির সজাগ সক্রিয়তার ফলে বিপ্লবী সত্তাকে ধর্মের মোড়ক লাগিয়ে আইনের ফাঁদে ফেলে বন্দী করা হয়। ‘নিঃশব্দবান’ গল্পে বলা হয়েছে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক নেতারা দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের কীভাবে বিভ্রান্ত করে। দলিতদের দরিদ্র ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ভোটের মুখে রাজনৈতিক নেতারা ‘গীতা ছুঁয়ে’, ‘মা কালীর ছবি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা’ করায়। লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর এই গল্প আজকের দিনেও মনে করিয়ে দেয় ধর্মকে কি সাংঘাতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধর্ম বিশ্বাস দিয়ে কত সহজেই দলিত সমাজকে চূপ করানো যায় তার কদর্য রূপকে লেখক এখানে দেখিয়েছেন। ‘একটি রাজনৈতিক হত্যা’ গল্পে রয়েছে দরিদ্র মানুষেরা রাজনৈতিক চক্রান্তে ফেঁসে গেলে তাদের জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠে। গল্পে মণ্ডল আর কৃতান্ত দুজনে আলোচনা করে এই বিষয় নিয়ে। সমাজে যে ধর্মগুরু গেরুয়া পোষাক পরে ধর্মের বুলি আওড়াচ্ছেন সে দিনশেষে একজন ধর্মক। আর যে লোকটাকে অভদ্র অসামাজিক বলে লোকে নিন্দে করে, সে নিজের মৃত্যুর পর যাতে তার সমস্ত সম্পত্তি অনাথ আশ্রম পায়, সেই মর্মে অনেক আগেই দান করে রেখেছে। যারা জমিদার, জোতদার তাদের হাতে পুলিশ প্রশাসন রয়েছে। সাধারণ মানুষের ক্ষমতা নেই তাদের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার। লেখকের ভাষ্যে-

“ক্ষমতাবানদের হাতে নিঃস্ব মানুষের অত্যাচারিত হবার ইতিহাস হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। এর কোনো বিরাম নেই, বিরতি নেই। কাক কাকের মাংস খায় না কিন্তু মানুষ মানুষের মাংস খায়। একদল মানুষের রক্ত মাংস ঘাম মজ্জা চোখের জল শুষেই আর একদল মানুষের বাড়বাড়ন্ত।”^৫

এই গল্পে মণ্ডলের ডান হাত কাটা। কারখানার দুর্ঘটনায় তার একটি হাত চলে যায়। কৃতান্ত থাকে মাধবপুর রেলস্টেশনে। জন্ম এবং বড়ো হয়ে ওঠা সেখানেই। তার পরিবার বলতে কিছুই নেই। রেলস্টেশনকেই সে বাসস্থান মনে করে। মণ্ডল চুরির দায়ে ছয় মাস যখন জেলে ছিল তখন জেলখানার নিয়মনীতি, অকথ্য অত্যাচার নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে। সেজন্য বর্তমান বিচারব্যবস্থার উপর তার যে বিশ্বাস নেই সে কথা কৃতান্তের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে-

“তাই দুর্মূল্য বিচারব্যবস্থার কাছে আমি যেতে পারবো না। অভিযোগকারী আমি, বিচারকও আমি। দণ্ডদাতা সে-ও আমি। আমার অপরাধীকে নিজের হাতে আমি তার প্রাপ্য সাজা বুঝিয়ে দেব। টিল টু ডেথ।”^৬

আসলে লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী সমকালীন সময়ের বিচারব্যবস্থাকে ধনবানদের হাতের পুতুল বলে কটাক্ষ করেছেন। তাদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য সমস্ত রকম দরজা খোলা আছে। আর দরিদ্র অসহায় মানুষেরা সেই বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে নানা অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত হয়। গল্পটি তারই একটি নিদর্শন। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর দলিত চেতনা সমৃদ্ধ একটি গল্প হল ‘ন্যাতা’। এই গল্পে দলিত মানুষদের রাজনৈতিক স্বার্থে কীভাবে বদলে ফেলা হয় তার চিত্র ফুটে উঠেছে। জাত-পাতহীনতা, অস্পৃশ্যতা বিরোধ, হিন্দু মুসলিম ভাই-ভাই এই সকল সৌহার্দ্য ভোট এলেই দেখা যায়। রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেরদের স্বার্থে নতুন করে দলিতদের বিপথগামী করে তোলে। বর্তমান সময়েও এই ঘটনা অবিরত ঘটে চলেছে। লেখক তাঁর লেখায় এই ভণ্ডামি এড়িয়ে যেতে পারেননি। এই গল্পের চরিত্র শিবেন মাস্টার, ভোট এলে যার পদবীর থেকে ‘মাস্টার’ শব্দটি বেশি প্রচলিত হয় জনসাধারণের কাছে। এতে রাজনীতির ক্ষেত্রে সুবিধাও হয় এবং নিজের জাত পরিচয় ঢাকা পড়ে। নাম হলে পদবীটা বড় বিড়ম্বনাদায়ক মনে হয়। সেজন্য শিবেন মাস্টারকে একজন কটুক্তি করে বলেছে-

“কী মশাই নামের পিছনে মাষ্টার জড়িয়ে বসে আছেন! ওতে কি জাত পরিচয় বোঝা যায়। মাস্টার তো মুচি চামার যে কেউ হতে পারে, ব্রাহ্মণ হতে পারে না। বর্ণশ্রেষ্ঠ জাতির মানুষ আপনি। গর্বের সাথে বলুন আমার পদবী ষড়ঙ্গী। আমি ব্রাহ্মণ।”^৭

জাতপাতের ভণ্ডামি না থাকলে এরকম চিন্তাভাবনা করা যায় না। তার ভয়াবহ চিত্র এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। ভোট এলে, উঁচু জাত ও নীচু জাত বলে কিছু নেই এসব বুলি আওড়ায় শিবেন মাস্টার ও তার দলবল। দলিতদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে ভোট আদায় করা যায় তার চিত্র এই গল্পে বলা হয়েছে। ভোট চাইতে এলে শিক্ষিত মানুষের মুখোশ জনাইয়ের অসহ্য লাগে। তাই কথক এখানে জানাচ্ছেন-

“খানিকটা কেমন যেন তালগোল পাকায় জনাইয়ের। সে আর ইসলাম আকবর এক নয়! ভাই ভাই নয়!

শিবেন মাস্টার ভাই? যে দাবায় উঠে বসে না, হাতের জল খায় না।”^৮

ধর্মে-ধর্মে বিবাদ সাধারণ মানুষের ছিল না। সমাজের শিক্ষিত তথাকথিত সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক নেতারা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছে। জাত-পাত অস্পৃশ্যতা যা হাজার বছর ধরে সমানতালে বহমান রয়েছে। কোনো পরিবর্তন নেই। তেমনি দলিতদের দু-একজনের পরিবর্তন ছাড়া পুরো দলিত সমাজই প্রতিনিয়ত দলনের স্বীকার হয় উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা। কর্মের কোনো মূল্য নেই। জন্মসূত্রেই মানুষকে বিবেচনা করা হয় সমাজে। সমাজের এসব ব্যভিচারের দিকগুলি মনোরঞ্জন ব্যাপারী লেখায় স্পষ্ট উঠে এসেছে। ‘লাঠি’ গল্পে হত দরিদ্র হারুর জীবনযন্ত্রণার কথা উঠে আসে। একদিন রাত্তা থেকে আসার পথে এক পাগলা কুকুর হারুকে কামড়ে দেয়। অভাবে পায়ের ক্ষতের যন্ত্রণা ও তার উপর অনাহার অর্থাৎহায়ে কাটে তার। এ নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় হারু। কয়েকদিন অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে দিন কয়েক পর সে নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়। একদিন পাড়ার এক চায়ের দোকানে হারুর সঙ্গে গজেনের দেখা হয়। হারু জানতে পারে গোবিন্দখুড়ো নামে এক নাইট গার্ড কুকুরের কামড়ে কয়েক বছর পর মারা যায়। এই কথা শুনে হারু চিন্তায় পড়ে যায়। তারও যদি কিছু হয়। এই মৃত্যুভয় হারুকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায়। কুকুরের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে একটি লাঠি সংগ্রহ করে। হারুর স্ত্রী শেফালি এলাকার ভেড়ির মালিক শ্রীমন্ত নায়েকের ভেড়িতে কাজ করে। এই সুযোগে হারুর অভাব ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে শেফালিকে পায়ের নুপুর বানিয়ে দেয়। অভাবের সংসারে শেফালির সখ আমোদ পূরণ করতে পারে না তার স্বামী। সেই সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন শেফালিকে ভোগ করে শ্রীমন্ত নায়েক। শেফালীর কথাবার্তার অসঙ্গতিতে হারুর বুঝতে আর বাকি থাকে না। সে একদিন রাতে পরিকল্পনা করে শ্রীমন্ত নায়েকের মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে। হারু করুণ সুরে বলে-

“আমদের সব কুত্তার জেবনরে। তুই-বা কী করবি আমি বা কী করব। এইভাবে বাঁচতি হবে।”^৯

‘লাঠি’ গল্পে কুকুরের ঘৃণিত জীবনের মতোই সমাজে অসহায় হারুর মতো নিম্নবর্ণের মানুষরা। এসব প্রান্তিক মানুষের যেমন জীবনের কোনো ভরসা নেই তেমনি মরতে চাইলেও অনেক সময় এরা মরতে পারে না। জীবনে বেঁচে থাকাটাই তাদের প্রধান সমস্যা অথচ বাঁচতেই হয় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। ফলস্বরূপ প্রভাবশালী কিছু মানুষ দারিদ্র্যের সুযোগ নেয়, শেফালির মতো নারী, যুবতীরা শ্রীমন্ত নায়েকের মতো মুখোশ পরা মানুষের প্রেম বা লোভনীয় কিছুর ফাঁদে পড়ে নিজের সংসারে অশান্তি ডেকে আনে। গল্পটি তারই একটি নিদর্শন। ‘পরিবর্তন চাই’ গল্পে নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, রাজনৈতিক শোষণের চিত্র এবং আত্মমর্যাদার লড়াইয়ের এক অদ্ভুত শক্তি প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই গল্পে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বিচারিতা এবং সুবিধাবাদী চরিত্রগুলিকে উন্মোচন করেছেন লেখক। এর পাশাপাশি পাঠককে এই গল্প একটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়, কার জন্য এই রাজনীতি? জনগণ নাকি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য? গল্পে চৌত্রিশ বছর পর বামফ্রন্ট সরকারের অবসান এবং তৃণমূল সরকারের নবউত্থান। সবদিকেই পরিবর্তনের জোয়ার। পরিবর্তন হয়নি কেবল সাধারণ প্রান্তিক মানুষের। এই গল্পে কাগজকুড়ানি ঢোলগোবিন্দের প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রণার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। ঢোলগোবিন্দ নিরক্ষর মানুষ। রাজনীতির কিছু বোঝে না। প্রাত্যহিক জীবনের তার স্বপ্নগুলো পূরণ হলেই সে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে সুখে থাকবে। কিন্তু এই স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পার্টির সিডিকেটের দালালি। সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে যায় ঢোলগোবিন্দের। তবুও অসহায় নিরন্ন ঢোলগোবিন্দ অন্ধকারে পড়ে থাকে। চারিদিকে পরিবর্তনের ঝকঝকে আলোয় স্বয়ং যেন দেবতা

হাসছে। অভাব অনটন ঢোলগোবিন্দের নিত্যসঙ্গি হলেও সে স্বাধীন মুক্তমনা মানুষ। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির হুকুমে চলার মতো লোক নয় ঢোলগোবিন্দ। নিজস্ব সত্তাকে সে বিলিয়ে দিতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে রাতের অন্ধকারে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ক্ষোভ ও অভিমান তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করা ঢোলগোবিন্দ রাস্তার মাঝে ঝুলানো নতুন পোস্টারগুলো নামিয়ে ফেলে। তারপর সেখানে ঝুলিয়ে দেয় অনেক দিনের পুরানো কিছু বিবর্ণ পোস্টার-

“সকালবেলা ঘুমচোখে শহরবাসী দেখে, মোড়ে মোড়ে ঝুলছে সেই পুরোনো ব্যানার। রং একটু ফিকে পড়েছে তবে লেখাগুলো একই আছে ‘পরিবর্তন চাই।’”^{১০}

এই গল্পে লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী দেখিয়েছেন কীভাবে শোষণ কেবল রূপ পালটে সামনে আসে। কোনো পরিবর্তন হয় না।

‘নেশা’ গল্পটি এমন এক মানুষের জীবনকে সামনে আনে, যার পেটের ক্ষুধা তাকে এই সমাজে এক সামাজিক এবং নৈতিক সীমানার বাইরে ঠেলে দেয়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বাইরে এই গল্পগুলি এই সমাজ তথা দেশকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। গল্পে গনেশ নামে এক রিকশাচালক দীর্ঘদিন অভুক্ত থাকার ফলে তার শরীরে নানা রোগ বাসা বেঁধেছে। যে রোগের জন্য সে ঠিক মতো কোনো কাজ করতে পারে না। দুর্বল লাগে তার। একদিন সেই ক্ষুধার্ত রিকশাচালক সওয়ারী নিয়ে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে যায়। পথচলা মানুষ মনে করে রিকশাচালক নিশ্চয়ই কোনো নেশা করেছে। এইজন্য তার এই অবস্থা। কথকের কথায়-

“কক্ষচ্যুত উক্কা ধেয়ে এসে আছড়ে পড়ছে গণেশের পেটে বুকো মাথায়। আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। শুধু অন্ধকার ... সীমাহীন নিরুদ্ভা, নিঃশব্দ অতল অন্ধকার।”^{১১}

শেষপর্যন্ত পথচলা মানুষ কেউ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা ভাবে না। পথেই মরে যায় রিকশাচালক গণেশ। বস্তুতঃ এ নেশা কোন তথাকথিত নেশা নয়, এ নেশা হলো ভাতের নেশা। লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর অধিকাংশ লেখাতে ক্ষুধাই হয়ে উঠেছে তার জীবনের একমাত্র চালিকাশক্তি। অন্য কোনো নীতি, আত্মসম্মান বা সমাজের নিয়ম সেখানে মূল্যহীন হয়ে গেছে। সেইজন্য তাঁর গল্পগুলিতে ক্ষুধা এক নেশায় পরিণত হয়েছে। সমাজের বাস্তব কঠোরতার চরিত্রগুলিকে তিনি গল্পে দেখিয়েছেন যারা অনেকটা সমাজ বহির্ভূত এবং যাদের সমাজ উপহাস ও অস্পৃশ্যতার চোখে দেখে। এজন্যই অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের থেকে তাঁর রচনামূল্যে বরাবরই ব্যতিক্রমী। ‘হেরো’ গল্পে ১৯৮০ দশকের দিকে এক সাহসী যুবার পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার দিনে মদ্যপান করা বস্তুর জেলার বাসিন্দাদের নিত্যদিনের ঘটনা। কাপসীর প্রাথমিক হাসপাতালে সেজন্য রোগীর লম্বা লাইন পড়ে যায়। প্রতিদিনই কেউ না কেউ মদ খেয়ে মারা যেত পর্যাপ্ত ওষুধের অভাবে। হাসপাতালের কর্মচারীরা গোপনে ঔষধ বিক্রি করে, এমন তথ্য আছে ওই যুবকটির কাছে। একদিন প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার ঔষধ উদ্ধার হয়। তারপর ডাক্তার, নার্স ও হাসপাতালের অন্যান্যরা কেউ রেহাই পায় না ওই যুবকটির প্রহার থেকে। তখন বস্তুর জেলা জুড়ে হইচই পড়ে যায়। অমৃত সন্দেশ পত্রিকায় খবর বের হয়- ‘সাহসী যুবা’ নামে ছেলোটর। ওই সময় দাঁড়িয়ে বিধায়ক জনকলাল ঠাকুর সাহসী ছেলোটর পক্ষে বিবৃতি দেয়, বিভাগীয় তদন্ত হয়। হাসপাতালের একাধিক কর্মচারী সাসপেন্ড হয়। সাহসী যুবকটি কাপসীতে দীর্ঘদিন ধরে মাদকাশক্তি দূর করার জন্য সংগঠন গড়ে তোলে। সে ছিল ছত্তিশগড়ের শ্রমজীবী মানুষের অবিসংবাদী জননেতা শঙ্কর গুহ নিয়োগীর লোক। শঙ্কর গুহ নিয়োগীজীও মনে প্রাণে চাইতেন এই অঞ্চলের আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষরা যেন মদ ত্যাগ করে। মদ ত্যাগ না করলে তাদের জীবনে পরিবর্তন আসবে না। তাঁকে শঙ্কর জানিয়ে সকলেই প্রতিজ্ঞা করে আজ থেকে আর মদ স্পর্শ করবে না। এ যেন ‘হেরো’ মানুষের নতুন করে বেঁচে থাকার এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা যা এই গল্পে আখ্যায়িত হয়। ‘সুখ-দুঃখ’ গল্পে উঠে এসেছে রাজনৈতিক উত্তাল সময়ে এক যুবকের প্রাণ ও ক্ষুধার টানে ফুটপাথে নারকেল বিক্রির করণ ছবি। তবে এখানে তার মতো অনেকেই নানা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে। যুবকটির দেখে মনে হয় প্রত্যেকেই তারা নিতান্ত গরিব। দু-চার টাকার জিনিস বেচে যা হয় তা দিয়েই পেট চলে যাবে। রাত ঘনিয়ে আসছে পাশের সোনার দোকানগুলোও বন্ধ করার তোরজোড় শুরু করে দিয়েছে। এমন সময় তার কানে এসে পৌঁছায় দোকানদাররা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, কার কত ইনকাম হল -

“তেমন কিছু না। আক্ষেপের সুরে বলে অন্যজন - দুই দশ। বাজার বড়ো খারাপ আজ। কাল সাড়ে তিন হয়েছিল।”^{২২}

যুবকটি অবাক হয়ে যায়। এ যেন এক পৃথিবীর মধ্যে দুটি আলাদা আলাদা পৃথিবী। একশ্রেণি দু-টাকার জন্য ক্ষুধা নিবারণ করতে পারছে না আর অন্য একশ্রেণি দিনে দু-তিন লক্ষ টাকা ইনকাম করেও খুশি হয় না। এমন বিষম মনে যুবকটি আরো দু-তিনটি নারকেল বিক্রির জন্য বসে আছে। অন্যদিক থেকে সস্তার পাউডার মাখা ক্ষুধার্ত একটি মেয়ে যুবকটির কাছে এসে বলে-

“দাদা রে সন্ধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। এখনও বউনি হয়নি। এট্রা টেকা ধার দিবি? আলুরদম পাউরুটি খাব। কাল তোরে ঠিক শোধ দিয়ে দেব। বড্ড খিদে লেগেচে। দিবি দাদা এট্রা টেকা!”^{২৩}

আসলে লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী জীবনে বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁর চরিত্রগুলি প্রথাগত ভদ্রলোক সমাজের বাইরের। তাই হয়তো তিনি এমন জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ‘ফোটোজেনিক’ গল্পে প্রধান চরিত্র এক ভিখারিনী মা। ষোলো-সতেরোর এই নাবালিকা মায়ের মাতৃত্ব সামাজিক বিচারে বৈধ না অবৈধ? সেই প্রশ্ন এসে যায় ফোটোশিল্পী শ্রীমান মিত্রের মনে। তবে ভিখারিনী মায়ের কোলে যে শিশুটি আছে দেখতে অনেকটা হাড় গিলগিলে মানুষের বাচ্চার মতোই। বাচ্চাটি বেশি নড়েও না, কাঁদেও না, কাঁদলে তার মা মুখে গুজে দেয় উদ্যম একটি স্তন। আর শিশুর ঠোঁটের উপর ফুটে ওঠে এক ফেনিল শুভ্রতা। লেখকের ভাষে-

“যেন মাতা মেরি আর শিশু যিশু। এই দৃশ্যের কোথাও কোনো যৌনগন্ধ নেই। তাই কোনো অঙ্গীলতা নেই।”^{২৪}

ঠিক এই সময়ে উদীয়মান তরুণ ফোটোগ্রাফার শ্রীমান মিত্র তার পেশাদারি দক্ষতায় দুর্লভ ছবিখানি নিজ হাতে ক্যামেরাবন্দী করে নেয়। যে রেলস্টেশনে ভিখারিনীকে এক টাকা পর্যন্ত কেউ সাহায্য করছে না, তার ছবি একদিন বিক্রি হয়ে যায় প্রচুর দামে। ফোটোগ্রাফার শ্রীমান মিত্র যেদিন পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফেরে, সেদিনই খবরের কাগজে বের হয় এক ভিখারিনী মায়ের অনাহারে মারা যাবার খবর। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর এরকম গল্পগুলি সমাজের এক নৃশংস চেহারার উন্মোচন করে। তাঁর ভাষা ঠাণ্ডা, কঠিন কিন্তু ভীষণ তীক্ষ্ণ। কোথাও সেরকম আবেগপ্রবণতা নেই। আছে এক বিষাক্ত যন্ত্রণার উদ্বায়ী প্রকাশ। সেই যন্ত্রণার নাম হল ক্ষুধা, অনাহার, দারিদ্র্যতা। ‘একটি দেবিস্থানের পত্তন কাহিনি’ গল্পে একদিকে যেমন ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম করে তৈরি হয় একটি দেবী স্থান, তেমনি অন্যদিকে তা হয়ে ওঠে একধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ণবাদী কর্তৃত্বের হাতিয়ার। গল্পে একটি রেলস্টেশনের পাশে বটগাছের নিচে একটি রিকশা স্ট্যান্ড। সেখানে সকল ধরনের মানুষ যাতায়াত করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেখানে মানুষের যাতায়াত কমতে শুরু করে। কারণ জায়গাটায় ভীষণ দুর্গন্ধ। এরপর রিকশা স্ট্যান্ডের নতুন সেক্রেটারি অভিমন্যু মণ্ডলের স্থানীয় রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে এক বৈঠকে ঠিক হয় তারা চাঁদা তুলে ওই দুর্গন্ধ জায়গায় একটি বোর্ড লাগিয়ে দেবে। শীতলা দেবীর বোর্ড লাগিয়ে তারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্ক করে লিখে দেয় -

“দয়া করিয়া এখানে কেউ প্রস্রাব করিবেন না।”^{২৫}

তবে নিত্যদিনকার প্রস্রাব করা যাত্রীরা বটগাছের দিকে তাকিয়ে থেকে অনুভব করে রঙ বেরঙের অপূর্ব এক কোনো চিত্র কল্পনা। তবে বোর্ডকে উপেক্ষা করে অনেকে নিষেধ না মানার খেলায় মাতোয়ারা হয়ে উঠে। সমস্যা আরো বেড়ে গভীরতর হয়। এরপর শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজা পাঠ শুরু হয়। মন্ত্রপাঠ করে হরিনারায়ণ চক্রবর্তী। আশেপাশের সবাইকে ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হয়। শীতলা পূজো বছরে একদিন হয় বলে এই সুযোগ নিয়ে হরিনারায়ণ চক্রবর্তী সেখানে কৌশলে ধর্মের আড়ালে রোজগারের আশায় -

“শনি-কালি-শিব মনসা-রাধা-কৃষ্ণ একে একে দেব-দেবীর লাইন লাগিয়ে দিল।”^{২৬}

তৈরি হল বড়ো প্রণামীর বাস্ক। কিছুদিনের মধ্যে সেখানে ইটের দেওয়াল তৈরি হয়। রাতারাতি ভক্তের দলও এসে হাজির হয়। ধর্মের নামে যা যা করণীয় সবই হয় এখানে। পরবর্তীতে এই মন্দিরের পুরোহিত স্টেশনের কাছে আটকাঠা জমি কিনে নেয়। ছয়খানা ঘরভাড়া সহ কতকিছু জীবনে কিনে রাখে। এদিকে অভিমন্যু আজও একজন দরিদ্র রিকশাচালক।

আক্ষিপের সুরে দেওয়াল টপকে সে ভাবে প্রস্রাবের গন্ধ এর থেকে ভালো ছিল। আসলে মনোরঞ্জন ব্যাপারী ধর্মের মোড়কে অন্ধবিশ্বাসকে একদমই মেনে নেননি। যে ভাবনা নিয়ে অভিমন্যুসহ বাকি রিকশাওয়ালারা বোর্ড লাগাতে সম্মত হয়েছিল, ঠিক তার উল্টোটা হয়েছে এই গল্পে। ঠাকুরের আড়ালে পয়সা অর্জনই মূখ্য করে তোলে এই গল্পের পুরোহিত। আর এখানেই দেবীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও পতন ঘটে। ‘হনন অভিলাষী’ গল্পে আইন ব্যবস্থার বিভিন্ন আইন ও রাষ্ট্রের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলি উঠে এসেছে। পুলিশ অফিসার সজল সরকারের নেতৃত্বে সদ্য ধরে নিয়ে আসা কুখ্যাত আসামীর জবানীতে একাধিক তথ্য উঠে আসে। গতবছর জোতদার অবিনাশ সামন্তকে নৃশংসভাবে খুন করে। ঠিক তার কয়েক বছর আগে মাস্তান শ্যামল মুখার্জিকেও খুন করে। এসব তথ্য পুলিশ অফিসার বয়ানের মাধ্যমে উঠে আসতে থাকে। মানুষ কি করে এত নির্মম হতে পারে। পুলিশ অফিসার ও বাকি আধিকারিকরা সেই আসামীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আসামীর বয়ান অনুযায়ী সমাজের কিছু অপরাধী আছে যারা বিনা অপরাধেও ছাড় পেয়ে যায়। তাই আইনের প্রতি তার কোনো বিশ্বাস নেই। দেশে কোনো বড় অপরাধী ব্যক্তির যদি সাজা হয় তাহলে কি তাকে কেউ সাজা দিতে পেরেছে আজ পর্যন্ত। বাথানিটোলা নরসংহার কাণ্ডের কথাও আসামীর মুখে উঠে আসে। যেখানে নিরপরাধ নির্দোষ অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধসহ ১০৬ জনকে রাতের অন্ধকারে গুলি করে মারা হয়। তারা প্রত্যেকেই ছিল দলিত দরিদ্র প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ। এদের অপরাধ হল উচ্চবর্ণ ভূস্বামীদের জমিতে প্রাপ্য মজুরের জন্য সরকারের কাছে বিচার চেয়েছে। এই কেসে মোট ৫৬ জন বন্দী ধরা পড়ে এবং জেলখানায় ২৫ বছর ধরে তাদের কেস চলে। লেখকের ভাষ্যে –

“চিতার যে আঙুন আর রসুইখানার যে আঙুন - আঙুন দুটোই। এখানে আঙুনের কোনো ভূমিকা নেই, যোগ্যতা নেই। আছে ব্যবহারকারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা।”^{১৭}

লেখক এখানে গল্পের কেন্দ্রে থাকা আসামীকে শুধু আইনি দণ্ডের মধ্যে দেখাননি। রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন হিসাবে সমাজে ন্যায় ও শ্রেণি সচেতনতার নতুন দিকগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

‘হালার পো হালা’ গল্পে রিকশাচালকের নিপীড়িত জীবনের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রে আছে কালাচাঁদ নামে এক রিকশাচালক, যে রিকশার মালিক অমর ঘোষের রিকশা চালিয়ে দু-পয়সা উপার্জন করে। এখানে রিকশার মালিক ভীষণ নির্দয় ও কঠোর জীবনে পয়সা ছাড়া কিছু বুঝে না। শর্ত হিসাবে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা মধ্যে রিকশা নেওয়া ও দেওয়ার সময়। সময় মতো পয়সা ও রিকশা অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে এই বিধান অমান্য করলেই চরম শাস্তি হবে। তবে এখানে শুধু কালাচাঁদেই একমাত্র রিকশাচালক নয়। তাঁর সঙ্গে পঞ্চা, অধীর, গোপালরাও মালিকের অধিনে ভাড়া নিয়ে রিকশা চালায়। এরা প্রত্যেকেই নিম্নবর্ণের মানুষ। বেশিরভাগ দিন তাদের অনাহারে কাটাতে হয়। একদিন মালিকের রিকশা কালাচাঁদের কাছ থেকে চুরি হয়ে যায়। এ যেন ভগবানও বড়ো নির্দয় ও নিষ্ঠুর। যে মানুষটার একবেলা খাবার যোগাতে প্রাণ আঁতকে উঠে সে কি করে রিকশার ক্ষতিপূরণ দিবে। এই ভেবে কালাচাঁদের অন্তর শুকিয়ে যায় মালিককে কি জবাব দিবে –

“কে বাঁচাবে কালাচাঁদকে অমর ঘোষের রোষ থেকে। রক্ষা পাবার একমাত্র পথ ট্রেনের নীচে লাফিয়ে পড়া। সেটাও ভেবেছিল কালাচাঁদ। কিন্তু ঘরে বউ আর দুটো বাচ্চা, তাদের কী হবে! কে দেখবে।”^{১৮}

এভাবে কিছুদিন চলার পর কালাচাঁদকে ধরে ফেলে অমর ঘোষ। রাগান্বিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে অমর ঘোষের জবাব –

“তুই কি আমারে গাভু ভাবছোস? কী মোনে কইরা এই গল্প ফাঁদছস? আমি বিশ্বাস কইরা নিমু তোর কথা? হালার পো হালা- কই রাখছোস রিকশাখান, শিগগির বাইর কর।”^{১৯}

কালাচাঁদ কোনোদিনই কারোর কোনো ক্ষতি করেনি। নিজের কাছে সে সৎ লোক। সে একজন শ্রমজীবী মানুষ। শেষে বাধ্য হয়ে কোনো উপায় না পেয়ে কালাচাঁদ ব্লাড ব্যাংকে সামান্য পয়সার বিনিময়ে রক্ত দিতে রাজি হয়। ‘ভারবাহী পশুর মতো’ নিজের শরীরটাকে টেনে টেনে মালিক অমর ঘোষের সামনে উপস্থিত হয় কালাচাঁদ। একটা তেল মাখানো টেবিলের উপর গুটি কয়েক টাকা আর রক্তদানের কাগজটা রেখে অসহায় হয়ে অমর ঘোষের সামনে আত্মসমর্পণ করে। লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী এই গল্পে শ্রমের উপর পুঁজির দখল ও মালিকানার নিষ্ঠুরতার কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। গল্পে

শোষক অমর ঘোষ এবং শোষিত কালাচাঁদের সম্পর্কের অসম্ভব ও নগ্ন বাস্তবতার চিত্র উঠে আসে। আর এদিক থেকে গল্পটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

‘ভাতের রাজা’ গল্পে ‘ভাত’ শুধু খাদ্য নয়, জীবনের অস্তিত্ব, সম্মান এবং অধিকার খুঁজে পাবার কাহিনি। গল্পের মূল চরিত্র ধীরেন ও তার দুই ছেলের সংগ্রামী জীবন। এই সংগ্রামী জীবনে তারা কেবল আত্ননাদ করত ‘মাগো ভাত দাও’ বলে। ক্ষুধা, অনাহারের মধ্য দিয়ে প্রতিটি রাত তাদের কাটে প্রতীক্ষায়। এই নিষ্ঠুর জগৎ তাদের জানিয়ে দেয় তারা এই পৃথিবীর ‘প্রয়োজনহীন’ মানুষ। শুধু ধীরেনের পরিবার নয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যসংকট ও দারিদ্রের করুণ ছবি দেখানো হয়েছে এই গল্পে। এই অন্ধকার বিস্ময়ে ধীরেনের স্ত্রী যন্ত্রণা ও হতাশা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে-

“হে সর্বশক্তিমান খিদে আর তুমি কষ্ট দিও না। এবার আমাদের খাও।”^{২০}

হয়তো একরাশ হতাশা ও গ্লানি নিয়ে ঈশ্বরের কাছে বিদায়ের প্রার্থনা করছে তারা। তবে এ যন্ত্রণা ও হতাশা তাদের এক দিনের নয় দীর্ঘদিনের। গরিব মানুষ যে সমাজের জঞ্জাল আর সে জঞ্জালের মধ্যে ভগবানও যে নিষ্ঠুর ধীরেনের স্ত্রীর এই কথাতাই তা ব্যক্ত হয়। স্বামী ও স্ত্রীর এই হতাশা যখন ক্রমশ ঘন হয়ে আসে তখন ধীরেন তার দুই সদ্যজাত শিশুকে ক্রোধে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়। যে ক্ষুধার জন্য ধীরেনের জীবনের এত লড়াই ও সংগ্রাম সে ক্ষুধাই একদিন তার দুই ছেলেকে কেড়ে নেয়। এজন্য তার দশ বছরের জেল হয়। এই রাষ্ট্র, বিচারব্যবস্থা ও আইনের কাঠামোতে ধীরেন একজন খুনি আসামী হিসাবে গণ্য হয়। রাষ্ট্র রায়ে দেয় অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ধীরেন তার দুই ছেলেকে খুন করেছে। আসলে অধিকার তো সকল মানুষের ক্ষমতার মূল উৎসে অবস্থান করে। সেই অধিকারই একদিন ধীরেনকে হিংস্র বানিয়ে দেয়। ‘চলার পথে’ গল্পে যান্ত্রিক জীবনের গতিময়তার পরিচয় পাই এক লেখকের জীবনে। জনপ্রিয় ‘প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকায়’ লেখার আহ্বান আসে লেখকের কাছে। কেননা সেই লেখক একজন ‘শ্রমিক লেখক’ বা ‘জমিন লেখক’ এবং একজন সংগ্রামী মানুষ হিসাবে সমাজে পরিচিত। জীবনে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করে তিনি বেঁচে থাকেন। সমগ্র জীবনটাই তিনি ক্ষুধা ও অন্যায়ে বিরুদ্ধে লড়েছেন। এরকম একজন সংগ্রামী লেখোয়াড়ের হাতে এই পত্রিকা দ্রুত এগিয়ে চলবে বলে সকলে আশা করে। শত আশা নিয়ে যখন লেখক পত্রিকা অফিসের সামনে এসে হাজির হন তখন দেখেন অফিস বন্ধ। একরাশ হতাশা নিয়ে লেখক তখন ফিরে যান। এই হল আজকের সমাজে ‘প্রগতি’র চিন্তাচেতনা। আলোচ্য গল্পে লেখক সূর্যবাবু মহাশয়ের জবানীতে ‘প্রগতি’ সাহিত্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বয়ান-

“প্রগতিশীল সাহিত্য! কি গাল ভরা নাম। কে পড়ে মশাই এসব ছাইপাশ! প্রগতি এখন গতিহীন হয়ে মুখ খুবড়ে পড়েছে দুর্গতিতে।”^{২১}

আসলে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখক হয়ে ওঠার যে কাহিনি আমরা ‘ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন’ আত্মজীবনীতে পাই তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই গল্পে। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ছোটগল্পগুলিতে প্রতিবাদ ও আত্মপরিচয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোনো ধারণা নয়। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিবাদই তাঁর গল্পগুলিতে আত্মপরিচয় নির্মাণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পগুলি দলিত জীবনের কষ্টকে করুণা নয়, বরং শক্তিতে রূপান্তর করেছে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা প্রথাগত অর্থে বিপ্লবী নায়ক নয়, তারা শ্রমজীবী, দলিত, দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষ। এসব শ্রমজীবীদের জীবনযাপন নীরব প্রতিরোধ ও আত্মসম্মানবোধই হয়ে ওঠে প্রতিবাদের আখ্যান। এই কারণেই মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ছোটগল্পগুলি বাংলা দলিত তথা ভারতীয় দলিত কথাসাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছে একথা নির্দিষ্ট বলা যায়।

Reference:

১. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, ‘জীবনের গল্প গল্পের জীবন’, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, তবুও প্রয়াস প্রকাশনী, পৃ. ২৮
২. তদেব, পৃ. ৩১
৩. তদেব, পৃ. ৫৭
৪. তদেব, পৃ. ৯৭

৫. তদেব, পৃ. ১৭৭
৬. তদেব, পৃ. ১৮৫
৭. তদেব, পৃ. ২৩১
৮. তদেব, পৃ. ২৩৩
৯. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, 'না- মরা মানুষ ও অন্যান্য গল্প, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, তবুও প্রয়াস প্রকাশনী, পৃ. ৬৩
১০. তদেব, পৃ. ২২১
১১. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, 'গল্প সমগ্র ১', প্রথম প্রকাশ ২০২২, তবুও প্রয়াস প্রকাশনী, পৃ. ৩৯
১২. তদেব, পৃ. ১৩১
১৩. তদেব, পৃ. ১৩২
১৪. তদেব, পৃ. ১৬০
১৫. তদেব, পৃ. ২৮১
১৬. তদেব, পৃ. ২৮৩
১৭. তদেব, পৃ. ৩৯৭
১৮. তদেব, পৃ. ৪৮০
১৯. তদেব, পৃ. ৪৮১
২০. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, 'গল্প সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ১৪২৩, বইওয়াল প্রকাশনী, পৃ. ২৩
২১. তদেব, পৃ. ৫৮

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

- ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮, কলকাতা।
- লিঙ্গালে, শরণকুমার, 'দলিত নন্দনতত্ত্ব', (অনুবাদ) মৃন্ময় প্রামাণিক, তৃতীয় পরিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১, কলকাতা।
- বালা, যতীন, 'দলিত রচনা দলিত লেখক', ১ম খণ্ড, গাঙচিল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০২০, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, শুভঙ্কর, 'শ্রেণি জাতি অস্পৃশ্যতা', প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৯, গাঙচিল প্রকাশনী, কলকাতা।
- চক্রবর্তী, স্পিভাক, গায়ত্রী, 'গণতন্ত্রের রহস্য', সমর সেন স্মারক বক্তৃতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৯, অনুষ্টুপ, কলকাতা।
- রায়, দেবেশ, সংকলন ও সম্পাদনা, 'দলিত', চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি।

ইংরেজি গ্রন্থ :

- Mukherjee, Sipra, translator. Interrogating my Chaldal life. An Autobiography of a Dalit. By Manaranjan Byapari, Sage publications India Pvt Ltd, 2018.
- Biswas, Manohar Mouli, 'Bengal Dalit Literature and Culture: A Dignity Discourse', in voice of Dalit, 2012.